বাংলায় আর্নল্ড বাকে: একটি 'টান-ভালবাসা'র গল্প

'শুরুতে শব্দ ছিল'। বিবিসির জন্য এক বক্তৃতামালার এমনই শিরোনাম দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনীয় পিয়ানিস্ট এবং কন্ডাক্টর ড্যানিয়েল ব্যারেনবয়েম। আর্নল্ড বাকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের শুরুতেও কিছু শব্দই ছিল, স্থান, কাল, পাত্রের সূচক হিসেবে—কিছু লেখা শব্দ, কিছু শোনা, কিছু যন্ত্রে ধারণ করা। ২০০৪-এর কোনো এক দিন, লন্ডনে বৃটিশ লাইব্রেরির সাউন্ড আর্কাইভে এটা সেটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ক্যাটালগে একটি রেকর্ডিং এর বিবরণে 'কেন্দুলি', '১৯৩২', 'অচিন্তদাসী', 'মুরলি দাসের সেবাদাসী', 'বাউল গান'—একই বাক্যে এইসব শব্দ দেখে খুবই কৌতূহল হয়েছিল। তখন লাইব্রেরির কাছে এই রেকর্ডিংটি শোনার অনুরোধ জানাই। আর শুনতে গিয়ে দেখি, ঘশঘশ শব্দে কিছু একটা ঘুরে চলেছে আর তার তলায় ক্ষীণ স্রোতের মতন কী একটা যেন সুর বইছে। খানিক চেনা চেনাই লাগে। 'বাকে সিলিন্ডার কালেকশন' বলে লেখা ছিল ক্যাটালগে। ব্যাপারটা খুব যে ভাল বুঝতে পেরেছিলাম, তা নয়; তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে এই রেকর্ডিং বাকে নামের কেউ একজন ১৯৩২-এ, কেন্দুলিতে করেছিলেন।

সে-ই শুরু। আর্নল্ড বাকে নামের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, মোমের সিলিন্ডারের শব্দের সঙ্গেও। গত দশ বারো বছর ধরে একটু একটু করে সেই শব্দের বীজ থেকে একটা টানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমাদের আর্নল্ড বাকের সঙ্গে, এবং সেই প্রথম-শোনা শব্দ থেকে আরো অনেক শব্দের দিকে যাত্রা করেছি আমরা। শব্দ থেকে শব্দের দিকে, সময় থেকে সময়ে। এবং সেই শব্দ আর সময়কে বুনে, বেঁধে চলতে চলতে কোথায় এসে দাঁড়ালাম আর এর পর কোথায় যেতে পারি, 'টাইম আপন টাইম: আর্নল্ড বাকে ইন বেঙ্গল'—আমাদের এই প্রদর্শনী তারই কিছুটা হদিস পেতে চাইছে।

আর্নল্ড বাকে (১৮৯৯-১৯৬৩) তাঁর হল্যান্ডের মাস্টারমশাই, প্রত্নতত্ত্ববিদ ফিলিপ ভোগেল এবং সংস্কৃতজ্ঞ উইলেম কালান্ড-এর অনুপ্রেরণায়, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকর্ষণে ২৬ বছর বয়সে স্ত্রী কর্নেলিয়াকে সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে আসেন। আপাতভাবে উদ্দেশ্য ছিল ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ *সঙ্গীতদর্পণের* বিশ্লেষণ, কিন্তু এমনিতেই তাঁর নানা বিষয়ে উৎসুক মন ও মনন, তায় এসে পড়েছেন শান্তিনিকেতনে, যেখানে সেই সময় নানান মানুষের বাস আর আনাগোনা, বহু সুর-স্বর-চিন্তার আদান প্রদান, ফলে *সঙ্গীতদর্পণ*কে অতিক্রম করে বাকে'র জ্ঞানচর্চা নানা দিকে ধাবিত হয় এবং শান্তিনিকেতনের ভূগোল পেরিয়ে তিনি কাছে, দূরে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান প্রধানত গান বা আর কোনো সুর-স্বর-তাল-ছন্দ শোনা এবং তাকে বিভিন্ন উপায়ে ধারণ করার জন্য।

প্রথম দফায় (১৯২৫-২৯) যখন আর্নল্ড বাকে ভারতে আসেন, তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে শব্দ রেকর্ড করার জন্য কোনো যন্ত্র ছিল না (অন্তত এখনো পর্যন্ত আমরা তেমনই জেনেছি)। যা শুনতেন, যা কানে আর মনে ধরতো, তার কথা কখনো মা'কে চিঠিতে জানাতেন, ফটো তুলে পাঠাতেন কখনো, অনেক সময় সেই সুর আর গান নিজে শেখার চেষ্টা করতেন, শিখেও ফেলতেন নিজের মতন করে, তারপর সেই গান হয়ত অন্য নানান দেশের গানের সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে গাইতেন—অদ্ভুত কম্বিনেশন, আইরিশ গান, রশিয়ান গান, রবি ঠাকুর, ভাটিয়ালি, শুবার্ট (আর্নল্ড বাকে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী পিয়ানো বাজাতেন)। কোনো কোনো গানের আবার নোটেশনও করে রাখতেন। এইভাবেই ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথদের 'বড়দাদা'

দ্বীজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের কথা মা'কে লিখতে গিয়ে আশ্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা 'ব্রাহ্মণ শিক্ষক' ও ছাত্রদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল, সেই কথা জানিয়েছিলেন—'কী অপূর্ব যে লাগছিল তানপুরার সঙ্গে গাওয়া সেই সুর!' কোথায় হচ্ছিল সেই অনুষ্ঠান, তা বোঝাতে গিয়ে মা'কে ছাতিমতলার একটা ছবি তুলে, পিছনে ক্যাপশন লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এ-ও লিখেছিলেন সেই চিঠিতে যে, পরের দিকে অনেকের বিরামহীন কথায় তাঁরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন, 'বিশেষ করে, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না'। 'এমনকি গুরুদেবেরও আর ভাল লাগছিল না, তাই দু' ঘন্টা কেটে গেলে পরে তিনি স্রেফ সভা থেকে উঠে চলে যান। এমনটা অবশ্য শুধু গুরুদেব হলেই করা যায়।'

একই সঙ্গে বোধ করি যে, এমন কথা হয়ত শান্তিনিকেতনের একজন না হলেই শুধু লেখা যেত। তাও ঠিক ছাপার জন্য নয়, মায়ের সঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়।

আর্নল্ড বাকের চিঠি অনেকটা একজন নিবিষ্ট গবেষকের ফিল্ড নোটবুকের মতন। অকপটে লেখা, তাই ভাল মন্দ অনেক কথা রয়েছে তাতে, কার কেমন লাগতে পারে, তা ভেবে লেখা নয় ঠিক। সেই চিঠি এই প্রদর্শনীর অন্যতম মূল সম্পদ; তার সঙ্গে রয়েছে বাকের তোলা ফোটোগ্রাফ, অডিও রেকর্ডিং, ফিল্ম, আর নানান বিষয়ে বাকের লেখা আর বাকে সম্পর্কে জানতে পারা নানা কথা। এই প্রদর্শনীতে আমরা যেমন আর্নল্ড বাকেকে সমসাময়িক বাংলার মানচিত্রে স্থাপন করার চেষ্টা করেছি, তেমনি বাকের শ্রবণে আর মননে ধরা এক বঙ্গদেশকে দেখতে চেয়েছি। তাঁর সময়ের নানা মানুষকে এবং তাঁদের সুর-শব্দের জগতের দিকেও আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে, আমাদের আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বাকেকে কীভাবে শুনবো আমরা, এবং বাকের কণ্ঠস্বরের ভিতরে কোন সময়কে শুনবো, সেই কথাও আমাদের ভাবিয়েছে।

শব্দ দিয়ে শব্দের দিকে আর নৈঃশব্দ্যের দিকেও যেতে চেয়েছি আমরা।

আর্নল্ড বাকে দ্বিতীয়বার বাংলায় তথা ভারতে ফিরে আসেন ১৯৩০-এ। এবার তিনি সঙ্গে করে রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন। প্রথমবার তাঁর শান্তিনিকেতনে বিশেষ ভাব হয়েছিল ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে। ক্ষিতিমোহন সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, 'তাঁকে দেখলে আমার মনে হয়, কবীর বুঝি এমনই একজন মানুষ ছিলেন,' মা'কে এতখানি লিখেছিলেন বাকে। ক্ষিতিমোহনের কাছে তিনি বাউল এবং উত্তর ভারতের ভক্তিবাদ সম্পর্কে জেনেছিলেন। ফলে, রেকর্ডিং এর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসার পর, কেন্দুলি ছিল বাকের স্বাভাবিক গন্তব্যস্থল। বাউলের গান, কীর্তন, পথে শোনা টুকরো বাঁশির সুর, সাঁওতালদের মাদল—এক সুর থেকে আর এক সুরে যেতে লেগেছিলেন আর্নল্ড বাকে। মঙ্গলডিহির সিঙ্গা আর ময়নাডালের খোলের জটিল বোল ধরা পড়ছিল তাঁর রেকর্ডিং যন্ত্রে, কলকাতায় নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের কীর্তন রেকর্ড করছিলেন; আর শান্তিনিকেতনে সাবিত্রী গোবিন্দের মীরা-কবীর-'মীনাক্ষী', লক্ষ্মীশ্বর সিনহার 'সিলেটি' লোকগান এবং বীরেশ্বর চক্রবর্তীর ভাটিয়ালি। এমনকি গুরুদয়াল মল্লিক মহাশয়ের পাঞ্জাবি গান পর্যন্ত। সিউরি মেলায় গিয়ে ময়মনসিংহের জারিগান শুনছিলেন, কেন্দুলিতে বাউল শোনার ফাঁকে রুমাল উড়িয়ে নেচে নেচে গান গাওয়া বাঁকুড়ার ভূমিজ মেয়ে কুসুমের ঝুমুর গান আর নাচের ছবি তুলছিলেন; ক্যামেরা ঘুরে যাচ্ছিল মন্দির আর অজয় নদের ওপর সার বাঁধা পূণ্যার্থীর দিকে।

একবার ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ট্রেনে করে চলে গেলেন বাকে তৎকালীন রাজশাহী জেলার সান্তাহার জংশনে, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে নওগাঁতে গিয়ে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রের অন্নদাশঙ্কর রায় এবং তাঁর মার্কিনী স্ত্রী লীলা রায়ের বাড়িতে উঠলেন আর্নল্ড এবং কর্নেলিয়া বাকে এবং 'হারামণি'-খ্যাত লোকগান সংগ্রাহক মহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সহযোগিতায় গাঁজা 'ওয়ার্কমেন' (শ্রমিক?)-দের ফকিরি গান রেকর্ড করলেন।

এমন সব অজস্র রেকর্ডিং, ছবি আর নির্বাক ফিল্ম আর ডাচ ভাষায় লেখা শত শত পৃষ্ঠার চিঠি (যা বর্তমানে আমাদের পড়তে সাহায্য করছেন ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাশ করা ইয়ান-সাইমন সোয়ার্টস)—এই সব নানা ডকুমেন্ট থেকে কীভাবে আমাদের সময়ে পৌছবো আমরা? এই শব্দ-গল্পের পথ ধরে এগোতে শুরু করলে কোথায় গিয়ে পৌঁছবো?

এই প্রদর্শনীতে আমরা খানিক সেই অজানার দিকে যাবার খেলাই খেলেছি। কোনো একটি নামকে পকেটে পুরে পথে বেরিয়ে হয়তো দেখি, সেই নামের কাউকেই পাওয়া যায় না, তার বাপ-মা নানি-দাদী কারো কাছেই যাওয়া যায় না, কিন্তু আর কোথাও যাওয়া যায় বৈকি। নওগাঁর গাঁজা শ্রমিক আসলে গাঁজার ফসল তোলার সময়ে গাঁজার কারখানার সামনে সেবা নিতে আসা ফকির ফকিরনির দল, তাঁদের ঘরের সন্ধান করতে যাওয়াটাই বাতুলতা। আমাদের গোটা বঙ্গদেশে এখন গাঁজার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কে বা কাহারা ওই গাঁজার কারখানার সামনে জড়ো হতেন, কী গান তাঁরা গাইতেন, এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পুরনো সান্তাহার স্টেশনে চিনি দেয়া গোল পাঁউরুটি একখানা কিনি, আর সন্ধ্যের প্রায় অন্ধকারের ভিতরে রুটি চিবোত চিবোতে হাঁটি আর ঈশ্বরদী রেল স্টেশনের কর্মী এনামুল ভাই হার্ডিঞ্জ ব্রিজের গল্প বলেন। পরদিন আমরা পাবনা শহর হয়ে সুজানগরে গিয়ে মনসুর উদ্দীনের কবর দেখি। আর নানা মানুষের নানা গল্প রেকর্ড করি।

এইসব শব্দ-গল্পের সঙ্গে আপাতভাবে আর্নল্ড বাকের কোনোই যোগ নেই, কিন্তু ওই যে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন যে বাকে সাহেব ফকিরনির অপূর্ব কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন, ফকিরনির কণ্ঠ বিদেশে চালান হয়ে গেল আর মনসুর উদ্দীন গানগুলি লিখে রাখলেন তাঁর 'হারামণি'র জন্য—এতে করে সান্তাহারের সঙ্গে সুজানগর আর বাকের সঙ্গে মনসুর উদ্দীন এমনিতেই মানচিত্রের রেখায় বাঁধা পড়ে গেলেন।

গুরুসদয় দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, অন্নদাশঙ্কর রায়, মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—বাকের সময়েরই সঙ্গীত সংগ্রাহক এঁরা সবাই। কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে আলাদা। এঁরা সবাই এই 'টাইম আপন টাইম' গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র। একজনের গল্প বললে অন্যজনের গল্পও এসে পড়ে। মজা লাগে ভাবতে যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'পদ্মা' বোটে চড়ে কাছাড়ি পরিদর্শনে বেরিয়েছেন, ১৮৯০-এর দশকে, তখন তাঁর যা বয়স, এই ৩০ মতন, বাকে যখন যাচ্ছেন নওগাঁতে, তখন তাঁরও ওই একই বয়স, ওই ৩০-এর কোঠায়ই। মাঝখানে কেবল ৪০টা বছর পার হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় মানুষের দৈনন্দিনের নানান ছবি 'রেকর্ড' করছেন তাঁর চিঠিতে আর ছোটগল্পে, বাকে তাঁর শোনা মানুষের কণ্ঠ ধরে রাখছেন তাঁর মোমের সিলিন্ডারে আর ক্যামেরার ফিল্মে। আর আমরা যখন ঈশ্বরদী থেকে সান্তাহার জংশনে যাচ্ছি আরো ৮০-৮৫ বছর পর, তখন জল কমে যাওয়া চলনবিল আর হারিয়ে যাওয়া মাছ—যে মাছ মারতে বর্শা লাগতো—তার গল্প শুনছি।

শান্তিনিকেতনে আমাদের এই প্রদর্শনী করার পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। শান্তিনিকেতন বাকেকে কতটা মনে রেখেছে, সেই প্রশ্ন অবান্তর। শান্তিনিকেতনকে বাকের কথা মনে করিয়ে দেওয়া এই প্রদর্শনীর লক্ষ নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতন যে বাকের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল, সেই কথাটা খুবই সত্যি। ১৯৫৫-৫৬ সালে আর্নল্ড এবং কর্নেলিয়া শেষবার দক্ষিণ এশিয়ায় এলে, আগে থেকে পরিকল্পনা করতে থাকেন শান্তিনিকেতনে কোথায় থাকবেন, পুরনো বন্ধু কাদের সঙ্গে দেখা হবে, পুরনো পরিচারক গণপতিকে আবার পাবেন কি না—এইসব। ক্ষিতিমোহন সেন তখন খুব অসুস্থ, তিনি বাকেকে চিঠিতে লেখেন যে বন্ধু, তুমি আমাকে আগের মতন দেখতে পাবে না আর। অন্নদাশঙ্কর রায় কেন্দুলিতে যাবার কী বন্দোবস্ত হতে পারে, সেই কথা বলেন, জানান যে শিল্পী মুকুল দে, যাঁর সঙ্গে বাকেরা ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী কিছুদিন আগে লীলা রায়ের সঙ্গে কেন্দুলিতে গিয়েছিলেন। এই ডিটেলগুলো থেকে একটা ঘর গৃহস্থের গল্প বেরিয়ে আসে, যে ঘর গৃহস্থালির মধ্যে আর্নল্ড এবং কর্নেলিয়াও ছিলেন এক সময়। আসলে, কর্নেলিয়ার যে ডাইরি পাওয়া যায় লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সংগ্রহের ভিতরে, তাতেও এমনই সব ডিটেল লেখা রয়েছে—কে এলো, কে গেলো, কে কী বললো, কে কার সঙ্গে ঝগড়া করলো, কেমন রান্না হলো, কোন বাজনা বাজালেন বাকে দম্পতি ঘরের গ্রামোফোনে--এইসব।

২৫ থেকে ৩৫-এর একদল যুবক যুবতী, তাঁদের ঘর যেখানে, সেখানেই কর্মস্থল। তারই মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, রেষারেষি, দ্বন্দ্ব। অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী, হৈমন্তী, করুণাকে (কর্নেলিয়ার নাম গুরুদেব দিয়েছিলেন করুণা) চিঠিতে লিখছেন, তোমার কাজের লোকটিকে যদি দরকার না থাকে, তাহলে আমার বাড়িতে অমুকের জন্য একটু পাঠিয়ে দেবে? আজই পাঠিও। আর, কত টাকা মাইনে দিলে ভাল হয়, একটু জানিও। এ একান্তই 'মেয়েলি' ঘরকন্নার কথা। ওদিকে অনেক বছর পর অমিয় চক্রিবর্তী নরেশ গুহকে চিঠিতে লিখেছিলেন, বাকে মানুষটা ছিল পল্লবগ্রাহী। কেন লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী এমন কথা? কোথায় দ্বন্দ্ব ছিল? কেন আর্নল্ড বাকে ১৯৩৩-এর পর তেমন সরাসরি আর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি? রবীন্দ্রনাথ যখন বাকেকে তাঁর গানের স্টাফ নোটেশন করার 'চাকরি' দেন, বাকে কেন তাঁর মা'কে লেখেন যে, সরাসরি গুরুদেবের সঙ্গে কাজ করতে পাবো এবার, শান্তিনিকেতনের অন্য লোকজনের সঙ্গে আমায় কিছু করতে হবে না, এতে আমি খুব খুশি?

'টাইম আপন টাইম' এইসব দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করতে চায়না। নানা খন্ড মিলে যে সুর-শব্দের ছবি তৈরি হয়, তা-ই দেখার আর দেখানোর চেষ্টা করেছি আমরা এই প্রদর্শনীতে। আর্নল্ড বাকে এবং তাঁর স্ত্রী শেষ যেবার ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন, ভারত তখন ভাগ হয়ে গেছে। অনেক কাল আগে যখন আর্নল্ড এবং কর্নেলিয়া বাকে প্রথমবার বাংলায় আসছেন, তখন লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক, সাটন পেজ আর্নল্ড বাকেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাংলায় যাচ্ছ, শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে জানো তো? নাহলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও বুঝতে পারবে না, বাংলাকেও না। আর ১৯৫৬তে বাকে সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে লিখছেন, আপনি আমাকে এবারের কাজে একটু সাহায্য করতে পারবেন তো? আমার খুব ইচ্ছে, কীর্তন বিষয়ে আরো ভাল করে জানার, এবার আমি বাংলায় কাজ করে মণিপুরেও যেতে চাই। আমার কীর্তনের শিক্ষক, সাথী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই একে একে চলে গেছেন। নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মন এখনও তাজা থাকলেও, শরীর অশক্ত হয়েছে।

আর্নল্ড বাকে শেষ পর্যন্ত মণিপুরে গিয়েছিলেন কি না, আমার জানা নেই। তবে কীর্তনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এই গান অনুরাগেরই গান। এই গানের প্রতি, বস্তুত বাংলার সুরের প্রতি আর্নল্ড বাকের এমন এক টান ছিল, যা তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল বার বার এই দেশে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সাধারণ মান-অভিমান সেখানে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। এই টানই সম্ভবত বাকের প্রতি আমাদের টানের পিছনে কাজ করছে।

মৌসুমী ভৌমিক
১১ মার্চ ২০১৬